ঘোড়াদহের চৌধুরী বংশ।

(ধর্ম্মপ্রাণ তিন পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পত্র হইতে সঙ্কলিত,
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়
১৯।৩ ছকু খানসামার লেন হইতে
শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩২৩ সাল।

——:o:——

সূচীপত্র।

ঘোড়াদহের চৌধুরী বংশ।

(ধর্ম্মপ্রাণ তিন পুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম পত্র হইতে সঙ্কলিত,
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়
১৯।৩ ছকু খানসামার লেন হইতে
শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩২৩ সাল।

——:০:——

অবতরণিকা।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাময়িক পত্রে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোড়াদহ গ্রামবাসী স্বর্গীয় সন্তোষ নারায়ণ, ভিক্ষাকর এবং রামকমল চৌধুরী এই তিন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার জীবন ও কর্ম্ম সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাই সঙ্কলন করিয়া সংশোধন, ও পরিবর্দ্ধন করতঃ একত্রে সংযোজিত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ঘোড়াদহ গ্রামে, বাগড়ী অঞ্চলে অন্যান্য গ্রামে, এবং মুরশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্যে আত্মীয় স্বজন নিকট জনশ্রুতিতে ঘোড়াদহ চৌধুরীবংশের বিস্তর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত স্বর্গগত রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাঁহার পিতা ও পিতামহের অনেক সাধুবাদ শ্রবণ করায় তাঁহাদের তিন বংশেরই জীবন কাহিনী যথাসাধ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সমীপে উপস্থিত করা হইল। যদি ইহা পাঠে কেহ প্রীত হয়েন তবে কৃতার্থতানুভব করিব।

বিনীত দীনাত্মা

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়
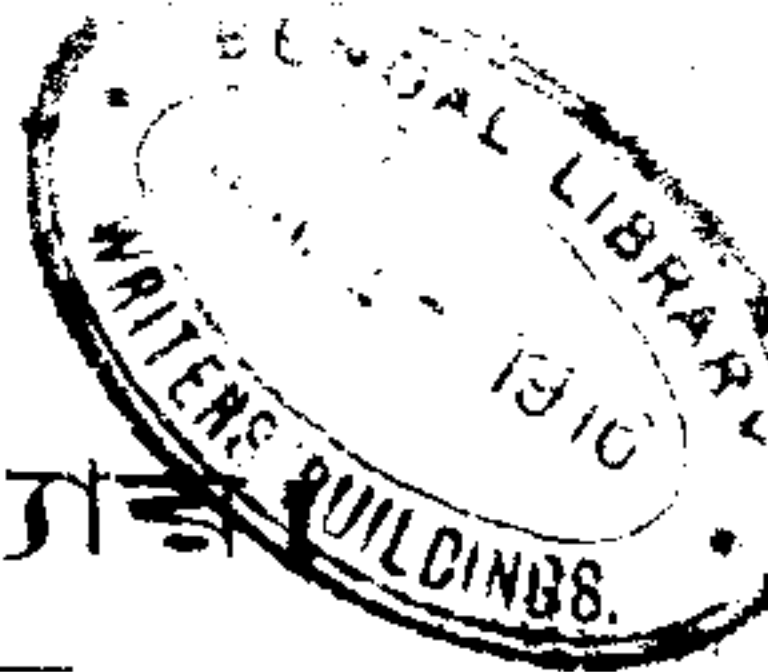
স্বর্গীয় সন্তোষনারায়ণ চৌধুরী।

"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"।

উপরে যে শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করা হইল, তাহার সফলতা সন্তোষনারায়ণের জীবনে এবং তাঁহা হইতে তৎপুত্রে তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসানুসারে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম ক্ষেত্রে সমন্বয় উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহাদের জন্মভূমিতে যে সকল সদনুষ্ঠান ও সদ্দৃষ্টান্ত আদর্শ স্বরূপে গণ্য হইয়াছিল এবং যাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও চৌধুরী বংশে ও তাহাদের গ্রামে দৃষ্টি গোচর হয়, এবং প্রাচীনদিগের প্রমুখাৎ উক্ত বিষয়ের বিবরণ যতদূর শ্রুত হওয়া যায়, তদবলম্বনেই এই প্রস্তাবের অবতারণা।

ইংরেজ আমলদারির অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নদিয়া জেলার অন্তর্গত জলঙ্গী (খড়ে) নদীর উপকূলে বাগড়ি অঞ্চলে ধোড়াদহ গ্রামে বারেন্দ্রশ্রেণী-ব্রাহ্মণকুলে সন্তোষ-নারায়ণ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, এমন কি স্ববংশীয় দুর্গোৎসবে স্বয়ং পূজকের কার্য্যে যোগদান করিয়া কতকটা পৌরোহিত্যও করিতেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ছিল। যে বংশে তাঁহার জন্ম, তাহার বসবাস ধোড়াদহ গ্রামেই প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের সময় হইতে ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, হাজার বৎসরের উপর ঐ গ্রামে ঐ বংশের বাস। ঐ গ্রামে কোন কোন সংরক্ষিত চিহ্ন দ্বারা জানা গিয়াছে যে হিন্দু রাজত্বের সময়ে ঐ বংশ ঐখানে বাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে উহার খুব প্রাচীনত্ব লক্ষিত হইলেও এক হাজার বৎসরের বাস বলিয়া অনুমিত হয় না কেননা, রাজা আদিসুরের সময় হইতে "কান্যকুব্জ"

দেশ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া বাস করেন তাঁহাদের বংশধরেরা ক্রমে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তাহার এক শ্রেণী বারেন্দ্র নামে অভিহিত হইলেন, অতএব তাঁহাদের বসবাস ঐ গ্রামে হাজার বৎসরের কিছু কম হয়।

বারেন্দ্রশ্রেণীতে যে সকল উচ্চ উচ্চ উপাধি আছে, তাহাদের মধ্যে "মৈত্র" একটী। সন্তোষ-নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ উপাধিধারী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান-রাজ্যের সময়ে অর্থাৎ মুরশিদাবাদের নবাবী আমলে তাঁহারা 'চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কেননা তাঁহারা কয়েকখানি গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন, আর ধোড়াদহ গ্রামখানিও তাঁহাদের পৈতৃক অধিকারভুক্ত ছিল। নবাবী রাজ্যকালে জমিদারদিগকে চৌধুরী উপাধি দেওয়া হইত। ঐ বংশধরেরা এখনও সেই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে তাঁহারা "ধোড়াদহের চৌধুরী" বলিয়া খ্যাত। একারণ তাঁহাদিগকে লোকে বুনিয়াদি বংশোদ্ভব বলিয়া এখনও মান্য করে।

সন্তোষনারায়ণ চৌধুরীর সাতটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রসন্তান না হওয়াতে তিনি মনে মনে বিষণ্ণ ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি একবার দুর্গোৎসবের সময় পূজা করিতে করিতে দেবীর সম্মুখে সকাতরে প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা! আমার বংশ বুঝি আর রক্ষা হইল না!" পরে সায়ংকালে তিনি যখন দুর্গা প্রতিমার সন্নিধানে আরতি করিতেছিলেন, তখন দেবীর মুকুটস্থিত জবাপুষ্প তাঁহার উত্তরীয়বস্ত্রে পতিত হইল। তিনি তাহা দেবীদত্ত প্রসাদ বিবেচনায় অতি যত্নে লইয়া বাটিয়া তাঁহার পত্নীকে খাওয়াইলেন। আশ্চর্য্য, তৎপরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মিল। তিনি তাহাকে দেবীর নিকট ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন "ভিক্ষাকর" এই পুত্রের বাল্যাবস্থায় সন্তোষনারায়ণ পরলোক গমন করেন। তাঁহার এক বুদ্ধিমতী কন্যা ছিলেন, তিনি ভিক্ষাকরের জ্যেষ্ঠা, নাম গৌরমণি। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া

গৌরমণি ঠাকুরাণী আপনার কনিষ্ঠকে পুত্রবৎ লালনপালন করিয়া মানুষ করেন এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে চালিত করিয়া ঐ গ্রামে মহামান্যা ও ধন্যা হন।

ভিক্ষাকর যখন সপ্তম বৎসরের বালক, তখন জমিদারী বিষয় লইয়া হঠাৎ জ্ঞাতিবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় পৈতৃক বিষয়ের ও টাকাকড়ির অংশাংশ সম্বন্ধে চৌধুরী বংশের মধ্যে এক ঘোরতর বিবাদ হয়, অর্থাৎ একবার পুণ্যাহের সময় "গোলক" (পুণ্যাহসময়ে আদায়ী টাকার ভাণ্ড ফুলচন্দনে সজ্জিত একটী হাঁড়ী) কে তুলিবে বলিয়া বয়স্ক জ্ঞাতিদিগের মধ্যে খুব মারামারি কাটা কাটি হয়। পুণ্যাহক্ষেত্রে দুই এক জন কাটা গেলে পর গৌরমণি দেখিলেন,—সে ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা দুষ্কর, কেননা সমগ্র ভূসম্পত্তিতে সন্তোষনারায়ণদের পৈতৃক একান্নভুক্ত উত্তরাধিকার অর্দ্ধাংশ ছিল। পাছে ঐ পিতৃহীন বালকের প্রাণের হানি

লইয়া গ্রামান্তরে গিয়া কোন কুটুম্বের আশ্রয়ে বাস করেন। ভিক্ষাকর যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতৃসমা বহুগুণসম্পান্না জ্যেষ্ঠা ভগ্নী গৌরমণি ঠাকুরাণী তাহাকে জন্মভূমি ধোড়াদহ গ্রামে লইয়া যান এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও আশ্চর্য্য প্রভাব সহকারে ভ্রাতার প্রাপ্য অংশ জমিদারী জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে বিভাগ করিয়া লন। তিনি এক্ষেত্রে একপ্রকার রাজনীতিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তখন ঐ গ্রামে প্রভাবশালিনী পরিচালিকা বলিয়া গণ্য হন। গৌরমণি একজন ক্ষণজন্মা নারী ছিলেন এবং গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিক্ষাকরের কিসে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি হয় এই তাঁহার স্পৃহা, চিন্তা ও যত্নের বিষয় ছিল। তিনি ভ্রাতার কল্যাণসাধনে বিশেষরূপে সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছিলেন।

ভিক্ষাকর চৌধুরী বয়োবৃদ্ধি সহকারে অত্যন্ত পিতৃভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বর্গগত পিতার অমোঘ

আশীর্ব্বাদ লাভে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ হইলেন যে, তিনি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার পৈতৃক জমিদারীতে নীলকুঠি, রেশমকুঠি ও তেজারতি ক্ষেত্রে বহুতর গোলাবাড়ী স্থাপিত করিয়া নদিয়া জেলার মধ্যে একজন ধনাঢ্য পুরুষ ও মহাজন বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি যেমন সুনীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, তেমনি বিষয়কর্ম্মে নৈপুণ্য হেতু সুকর্ম্মী বলিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিমিতব্যয়ী ও ভোগবিলাসশূন্য ব্যক্তি ছিলেন। বড়মানুষের মত সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিতেন, অথচ নিজের গৃহস্থালিটী সম্বন্ধে বড়ই মিতাচারী ছিলেন। এক দিকে তাঁহার খাজনা খানায় তোড়া তোড়া টাকা, তেজারতি সম্বন্ধীয় লেন দেনে "ঝন্ ঝন্" করিয়া বাজিত, আর দিকে তাঁহার গৃহিণী গৃহে গোসেবা করিতেন এবং পাকালয়ের প্রকোষ্ঠের বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরে গোবর চাপড়া দিতেন, তাহার শব্দ "থপ্ থপ্" করিয়া বাজিত। স্থূলদর্শী লোকে ভিক্ষাকর চৌধুরীকে কৃপণ বলিত। কেহ

কেহ আবার তাঁহাকে খুব পরিমিতচারের পক্ষপাতী ও বিলাসবিদ্বেষী দেখিয়া ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হইত না। কিন্তু যখন ক্রিয়াকলাপে ভিক্ষাকর অজস্র টাকা ব্যয় ও দানধ্যান করিতেন, তখন লোকে তাঁহার দানশীলতা ও উদারতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। গৃহস্থালীতে যদিও তৎকালে নিত্য ৪০।৫০টী ব্যক্তি ভোজন করিত, তবু সে সমস্ত রান্না তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রবধূদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। পরিজনদিগের মধ্যে কেহ যে আজকালকার ধাঁচার মতন বাবুগিরি করিয়া সময় নষ্ট অথবা আলস্যে বৃথা বড়মানুষি ধরণে বিচরণ করিবেন, তাহা ভিক্ষাকরের ধর্ম্ম ও কর্ম্মশিক্ষা-প্রণালীর বহির্ভূত ছিল। এই জন্য তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূদিগের মধ্যে সকলেই সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার পরিবার মধ্যে এখনকার বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের মতন নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। আর এখনকার ঘর পোষা হিষ্টিরিয়া (hysteria) রোগ যে কাহাকে বলে, তাহা ঐ সময়ে চৌধুরী-পরিবারের

কেহই জানিত না। এখন যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের ৬৪ প্রকার ব্যাধিকে বঙ্গমহিলারা এক প্রকার একচেটে করিয়া বসিয়াছেন এবং চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি ও গৃহের অভাব আমদানী করিয়া লক্ষ্মীদেবীর যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করতঃ তাঁহাকে তাঁহাদের স্ব স্ব আবাস হইতে দেশান্তরিত করিয়া দিতেছেন, সেকালে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে সেরূপ কিছুই ছিল না। সহজ ও সরল ভাবপূর্ণ মহিলারা কেবল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ও গৃহস্থালীর কর্ম্ম প্রিয়া ছিলেন। তাঁহাদের আমোদ ছিল কে কত ভালরূপ রন্ধন করিতে পারেন। রন্ধনকরিয়া আত্মীয়স্বজনকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া তাহাদিগকে স্নেহ ভালবাসা দেখাইব ও তাহাদের সস্নেহ ভালবাসা পাইব এই তাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই স্বাভাবিক পবিত্র গৃহ কার্য্যের মধ্যে এখনকার মত স্বার্থপরতা, অনুদারতা বা স্নেহ মমতা শূন্য ভাব স্থান পাইত না। এখন সবেই সেকালের সহজ সরল ভাবের কীদৃশ বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ি-

সেকালে শ্রমশীলা, বলিষ্ঠা, কর্ম্মিষ্ঠা, বিলাস-রহিতা সাধ্বী নারীগণের লক্ষ্মীমন্ত ও সুন্দর চরিত্রের দ্বারা আকৃষ্টা হইয়া আর্য্যদিগের চিরকালের ঘরপোষা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রসাদ আরও তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন এবং গৃহস্থদিগের প্রকৃত সৌভাগ্য বর্দ্ধনে রতা থাকিতেন। সন্তোষ নারায়ণের পুণ্যবলে এবং ভিক্ষাকরের আড়ম্বরবিহীন অথচ নিষ্ঠাসাধিত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভাবে ধোড়াদহের চৌধুরীবংশ এক সময় গৃহীর পক্ষে এরূপ সুন্দর আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ এখন দুর্ল্লভ।

ভিক্ষাকর চৌধুরী তাঁহার পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে সম্পন্ন করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিস্তর ব্যয় ভূষণ হইত ধোড়াদহ গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট আমরা এ বিষয় যাহা যাহা শ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে গেলে, বৃহৎ পুস্তক হয়। সংক্ষেপে ঐ শ্রাদ্ধের বর্ণন করিতেছি।

বৎসর যে মাসে যে ফলমূলাদি যেখানে হয়, তাহা স্বদেশ ও বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহার আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। তখন মুর্শিদাবাদের নবাবের খুবই বোলবোলা ছিল, একারণ নিজামতের চকে কাবুল কান্দাহার ও পশ্চিম দেশের বিস্তর মেওয়া ও ফল মূল আসিত, ভিক্ষাকর পিতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনের জন্য সে সকল সংগ্রহ করিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সন্তোষনারায়ণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উৎসবাকারে সম্পন্ন হইত। ভিক্ষাকর পূর্ব্ব হইতে স্বগৃহে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন। দূর দূরান্তর গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধের দিন ভোজন করান হইত। কোন কোন বৎসর ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১২০০ বার শতেরও উপর হইত। সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে একত্র ভোজন করান হইত। যে প্রণালীতে ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান ও সমাদর করা হইত, তাহা অতীব বিনয়-সম্পন্ন ও দীনতাপূর্ণ ছিল।

এক পুত্র দণ্ডায়মান থাকিতেন, তিনি যত্নে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে সাদরে দ্বিতীয় দেউড়ীতে তাঁহার এক ভ্রাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। তিনি আবার নিকটস্থ দরদালানে আর আর ভ্রাতাদের নিকট তাঁহাদিগকে সমাদরে পৌঁছাইয়া দিতেন। ঐ দরদালানে ভিক্ষাকরের অন্যান্য পুত্র ও পৌত্রেরা ব্রাহ্মণদিগের পদ ধৌত করিয়া দিয়া একটী ঘরে লইয়া গিয়া সরবৎ ও তরমুজ প্রভৃতি ঠাণ্ডা দ্রব্য দ্বারা জলযোগ করাইয়া সেই বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিনে তাঁহাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়া বৈঠকখানায় বা সভাস্থলে বসাইয়া দিতেন। পরে অতীব শ্রদ্ধা, ভক্তি ব্যবস্থা দ্বারা ভোজনাদি সম্পন্ন করান হইত।

ভিক্ষাকর ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া দৃষ্টিহীন হইলেন। যখন তিনি প্রাচীন বয়সে অন্ধ হইলেন, তখনও তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত উৎসাহ খর্ব্ব হয় নাই, বরং দীপ সলাকার (সলিতার) অগ্রভাগ কাটিয়া দিলে যেমন তাহা আরও প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমতিভাবে ভিক্ষাকরের

রূপ দীপের সলিতার অগ্রভাগ ছেদিত হওয়াতে তাহা আরও সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম প্রবাহ যেন অন্ধ ভিক্ষাকরকে আরও ধর্ম্মপ্রাণ ও ভক্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল। অন্ধাবস্থায় তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে আশ্চর্য্য ভাবে বিচরণ করিতেন। পিতৃ মাতৃ আশীর্ব্বাদে কি না হয়? পুরুষার্থ-পরায়ণ ভিক্ষাকর চৌধুরী বাহ্য চক্ষু হারাইয়াছিলেন বটে কিন্তু পিতা সন্তোষনারায়ণের আশীর্ব্বাদে ভগবানের কৃপায় তিনি দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন। সে সব বৃত্তান্ত মহাত্মা ভিক্ষাকর চৌধুরী মহাশয়ের জীবন কাহিনীতে বর্ণিত হইবে।

ভিক্ষাকরের অন্ধাবস্থাতেও তাঁহার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন সমান ভাবে চলিত, বরং তাঁহার ভক্তির মাত্রা যেন তাহাতে আরও বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল। পুত্রেরা তখন বড় হওয়ায় তাহাদিগকে সেই শ্রাদ্ধক্ষেত্রে এক এক বিষয়ের ভার দিয়া আশ্চর্য্য ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেন। পুত্রেরা পিতৃভক্ত ছিলেন।

যখন তাঁহার পুত্রেরা আহূত ব্রাহ্মণদিগকে ঐ শ্রাদ্ধের দিনে বিনীত ও ভক্তিভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন তখন অন্ধ ভিক্ষাকর কি করিতেন ? তিনি আগন্তুক ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষের জলে আর্দ্র হইয়া কাতর ভাবে গদ গদ স্বরে বলিতেন—"আমি চক্ষুহীন হইয়াছি, দেখিতে পাইতেছি না, ব্রাহ্মণঠাকুর দিগের কিরূপ সেবা হইতেছে !" তাঁহার পিতৃভক্তি দেখিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতেন। এখন বঙ্গের বড়ই দুর্দ্দিন ; সে দিব্যভাব পিতৃভক্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে ! "কালস্য কুটিলাগতিঃ।"

সন্তোষনারায়ণের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিতে তাঁহার সুপুত্র ভিক্ষাকর সংবৎসর ধরিয়া আয়োজন করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে দূর দেশ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ শ্রাদ্ধে চর্ব্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইয়া উপহার দানে তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা

প্রাপ্ত হইতেন। সে কালে নবদ্বীপে হস্তাক্ষরে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হইত, তাহাতে সন্তোষ নারায়ণের তিরোধান "সন্তোষপূর্ণিমা" বলিয়া উল্লিখিত হইত।

উপসংহারে "সন্তোষ চরিত" সম্বন্ধে পরিব্রাজকের একটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ধর্ম্মসহ কর্ম্মই সম্পদ।"

সন্তোষ চরিতামৃত, করিবারে সুবর্ণিত
মনে আসে তাঁর বংশ কথা।
সাধু পিতা সাধু পুত এ দৃশ্য কত মহত,
সংক্ষেপে বলিব তাহা হেথা।
ভিক্ষাকর পুত্র তাঁর, করি সদা সদাচার,
প্রিয় হয়েছিলেন সবার।
সন্তোষের নাম ধন্য বংশপতি গণ্য মান্য,
ইষ্ট সাধি পান ধর্ম্মসার।
ভিক্ষাকর গুণধর ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর
পিতৃপুণ্যে ভুঞ্জি কত সুখ।
ধৈরয ধরে হৃদয়ে বৃহৎ সংসার ল'য়ে

পিতৃঋণ শোধিবারে দান ধ্যান সৎকারে
থাকিতেন রত শুভদিনে ;
বর্ষে বর্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ, করি দান যথাসাধ্য,
সেবিতেন পণ্ডিত ও দীনে !
ধন্য সন্তোষ নারাণ লভি এমন সন্তান
পুণ্য কীর্ত্তি রাখিলেন গ্রামে।
ধন্য পুত্র ভিক্ষাকর পিতৃযশ শশধর
উজলিলে ধর্ম্ম অর্থ কামে।
ধন্যা কন্যা গৌরমণি নারীকুল-শিরোমণি
প্রভাবিণী থাকি পিতৃকুলে ;
সাধিলেন স্বকর্ত্তব্য সে বিবরণ বক্তব্য
ভিক্ষুর জীবনী বলে খুলে ॥
সেকাল একাল তত্ত্ব, বলিতে হই প্রবর্ত্ত,
দেখাবারে অতীত মহত্ত্ব।
আহা ! তাহা এই কালে, গ্রাস করিয়াছে কালে
পরাইয়ে শৃঙ্খল দাসত্ব।
তবে যদি স্মরি গত, আসে চিন্তা সুমহত,
এই আশে বর্ণি সাধ্যমত।
প্রাচীন বংশের মান জাগাতে নব্যের প্রাণ
ধর্ম্ম কর্ম্ম তত্ত্বে অবিরত।

"ধর্ম্মসহ কর্ম্মই সম্পদ্"।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্বর্গীয় ভিক্ষাকর চৌধুরী।

নদিয়া জেলার অন্তর্গত বাগড়ী অঞ্চলে ধোড়াদহ গ্রামে ভিক্ষাকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যার নবাবের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং বৃটিশ-পতাকা আস্তে আস্তে ভারতে শীর্ষ উত্তোলন করিতেছিল সেই সময় ধরাধামে তাঁহার আবির্ভাব। তৎকালে বঙ্গের জমিদারী মহল সকলের বিশৃঙ্খল হেতু জমিদারগণ এবং প্রজাবর্গ কত না অসুবিধা ও দুঃখভোগ করিত।

ভিক্ষাকর যখন বালক, তখন তাঁহাদিগের পৈতৃক জমিদারী লইয়া নিজামত আদালতে অন্যান্য জমিদারের সহিত মামলা মোকর্দ্দমা হওয়ায় প্রাচীন চৌধুরী বংশের পৈত্রিক স্বত্ব বজায় থাকিয়া জয়

লাভ হইয়াছিল। জ্ঞাতিদিগের মধ্যে যিনি ঐ সকল মামলা মোকর্দ্দমার জন্য মুর্শিদাবাদের নিজামত আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তথা হইতে জয়ী হইয়া আসিয়া তাঁহার গায়ের জোরে বলিতে লাগিলেন "এ বিষয় আমারই থাকিবে।" তাঁহার এক পুত্র ছিল যাহার নাম সকলে "হর চৌধুরী" বলিয়া ডাকিত। "হরের তাম্রকুণ্ড মধ্যে কাহাকে আসিতে দিব না" বলিয়া তাহার পিতা জ্ঞাতিদিগকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে উপস্থিত হইলে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হয়। ইহা লইয়া দুর্ভাগ্যক্রমে চৌধুরী বংশে এক বিষম বাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। নিজামত আদালতে জমিদারী স্বত্বের মোকর্দ্দমায় জয়ী হওয়ার বৎসরে পুণ্যাহ দিনে গোলক (প্রজা-দিগের প্রদত্ত সাইতের টাকার ভাণ্ড) ঘরে উঠাইবার সময় ঘোরতর কাটাকাটি ও মারামারি হইয়াছিল। ধাড়াদহের চৌধুরীরা ধর্ম্মবিশ্বাসে

শক্তি দেবীর পূজার ধুমধাম সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের ভবনে লাগিয়া থাকিত। এজন্য ছাগ বলিদানের খড়গ প্রায় ঘরে ঘরে থাকিত। ঐ কলহ ক্ষেত্রে যখন তাহাদিগের তহশীলদার ধোড়াদহের নিকটবর্ত্তী পিপলখোলা গ্রামনিবাসী কাশী চৌধুরী ঐ গোলক উঠাইতেছিলেন এবং প্রাচীন প্রথানুসারে আনন্দ-ধ্বনি স্বরূপ ঢুলিরা ঢোলের বাদ্য আরম্ভ করিয়াছিল তখন চৌধুরীবংশের একজন খড়গধারী ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া ঢুলিদিগকে বলিলেন "তোরা ঢোল এখন বাজাস্‌নে, গোলক কাহার ঘরে উঠিবে, তাহার মীমাংসা হয় নাই।" কিন্তু ঢুলিরা কাশী চৌধুরীকে গোলক তুলিতে দেখিয়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জোরে ঢোল বাজাইতে লাগিল। তখন সেই খড়্গধারী দৌড়িয়া গিয়া সজোরে ঢুলির মুণ্ড-চ্ছেদন করিল। ঐ মুণ্ডপাতের সঙ্গে সঙ্গে ঢোলের কিয়দ্দংশ সে খড়েগর আঘাতে কাটিয়া গিয়াছিল। আবার গোলক হস্তে কাশী চৌধুরীর সম্মুখে

বড়ই শক্ত মাথা ছিল বলিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদিত না হইয়া মাঝামাঝি অনেকটা কাটিয়া গেল। তিনি তখন গোলক ফেলিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে পিপলখোলা গ্রামে ছুটিলেন। ঐ গ্রাম সেখান হইতে দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশের কিছু অধিক। ধোড়াদহের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ পিপলখোলা ও ধোড়াদহের মাঝামাঝি মুচিদিগের উপনিবেশ ছিল, সেখানে গিয়া কাশী চৌধুরী তাঁহার মস্তকের ছেদিত স্থান একজন সুনিপুণ মুচিদ্বারা সেলাই করিয়া লইয়া বাটী গিয়া ক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধোড়াদহের প্রাচীন ব্যক্তিরা যখন এই সকল গল্প বলিতেন, তখন শ্রবণ করিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। সে সময় বাগড়ি অঞ্চলের লোকেরা বড়ই বলবান্ ছিলেন—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত বীরপুরুষ—যেমন দীর্ঘকায়, তেমনি বলশালী ছিলেন। তাঁহারা অধিক ভোজন করিতে পারিতেন, আবার লড়িতে ভিড়িতে তেমনি

লাঠি খেলা, তলওয়ার চালনা, প্রায় সকলেই অভ্যাস করিত। আবার শাক্তধর্ম্ম মতাবলম্বী যুবকেরা স্বয়ং ছাগ বলিদান করিতেন। সে কালে অস্ত্রচালনার চরম শিক্ষাটা যেন বলিদানের স্থানই নির্ণীত ছিল। উহা আর্য্য দিগের শস্ত্র শিক্ষার (Terget Practice) ভূমিস্বরূপ ছিল বলিলে হয়। শাক্তেরাই তৎকালে দেশরক্ষক ও ন্যায়পালন ক্ষেত্রে অভিভাবকরূপে বিদ্যমান ছিলেন। এখন আর সে দিন নাই। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেই স্বীয় স্বীয় বলক্ষয়ে দুর্ব্বলদেহে যেন বঙ্গরূপ একটা চিকিৎসালয়ে (হাঁসপাতালে) হা হুতাশ করিতেছে। হায়! শাক্তের সে শক্তি নাই বৈষ্ণবের সে ভক্তি নাই! একের শৌর্য্যবীর্য্য ও ন্যায়রক্ষণের প্রভাব এবং অপরের মাধুর্য্যভাব, প্রেমের লহরী ও ভাল-বাসা যেন কালের কুটিল গতিতে ভব নদীর স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের বংশধরেরা ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লীহা যকৃতের পীড়া ভোগে এবং

কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এখন সেখানে সে স্বাস্থ্য নাই, সে ধর্ম্মভাব নাই, সে কর্ম্মিষ্ঠতার চেষ্টা যত্ন নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন একটা খণ্ড-প্রলয়ের লক্ষণ সেখানে প্রতীয়মান হইতেছে। আর ভদ্র ঘরের বা ব্রাহ্মণকুলের মহিলারাও সেকালে কত বলিষ্ঠা ছিলেন। তাঁহারা শত শত লোকের ভোজের রন্ধন করিয়া পরিশ্রান্ত হইতেন না, পক্ষান্তরে প্রফুল্লবদনে ভোজের ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত কতই শ্রম করিতেন। এখন আর সেদিন নাই, ঘরে ঘরে নারীজাতির মধ্যে নানা পীড়া, তন্মধ্যে হিষ্টিরিয়া (Hysteria) সকল পীড়ার দলপতিরূপে বিদ্যমান। তাহার উপর গৃহবিচ্ছেদ, হিংসা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির প্রকোপ। ভগ্নগৃহ পাইলে যেমন সর্প, বিছা, ইন্দুর, চামচিকা প্রভৃতি জন্তুগণ আসিয়া বাস করে, ভগ্নসমাজে সেইরূপ জীবের কুপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুগণ বসবাসের সুবিধা পাইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানে একালে যে সকল সন্তান প্রসূত হইতেছে, তাহারাও দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ।

তাহারা বাল্যকালে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলের শিক্ষাক্ষেত্রে যেন বৃষকেতুবৎ বধ্য হইবার জন্য বসিয়া গিয়াছে আর বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ব্রাহ্মণ যেন বঙ্গরূপ দাতাকর্ণকে বলিতেছেন "বঙ্গের লোকেরা সন্তানের প্রাণদানে—অতিথি-সেবনে বেশ তৎপর ;—তা বেশ বৃষকেতুর মস্তকে করাত চালাইয়া যাও, উহাতে শোকার্ত্ত হইও না, আর বঙ্গগৃহিণী মাতা পদ্মাবতীর ন্যায় রোদন করেন করুন, ওটা নারীস্বভাব, কখনও যাইবার নহে। অতএব হে বঙ্গরূপ দাতাকর্ণ! সন্তান নিপাতে তুমি বিন্দুমাত্র শোক দুঃখ করিও না।" তবে আবার কি সেই ব্রাহ্মণ এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ধারণকরতঃ যথাসময়ে মৃত বৃষ-কেতুর প্রাণদানে প্রস্তুত হইয়া বলিবেন "হে বঙ্গরূপ কর্ণ, তোমার পুত্রকে লও, সে খেলিতেছিল, মরে নাই।" তাই "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" সমন্বিত নবশিক্ষা প্রণালী উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে হে ভাবী সৌভাগ্যের অধিকারী বঙ্গের সন্তানগণ! গাত্রোত্থান কর ও ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ কর হরিলীলা বঙ্গে কিরূপ আশ্চর্য্যভাব

ধারণ করিতেছে। ফলে ভগবান্ বঙ্গের আশা ভরসা, নইলে আমাদিগের ন'দের গোরা শচীনন্দন সর্ব্বত্যাগী ও একমাত্র হরিনাম সুধাপানে মাতোয়ারা হইয়া প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইবেন কেন? যে হরির লুট এখন মুড়কির লাড়ু ও বাতাসা প্রভৃতি সামান্য মিষ্টদ্রব্য যোগে বঙ্গে পল্লীতে পল্লীতে ঘরে ঘরে বণ্টন হইতে দৃষ্ট হয়, পরে তাহা অমৃতসদৃশ "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" ক্ষেত্রোৎপন্ন বিবিধ সুধাময় ফলের আকারে বিতরিত হইবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা মহা আশ্বাসের কথা; এখানে তাহা যে লিপিবদ্ধ হইল, তাহার একটু কৈফিয়ত প্রদান করা যেন দরকার। সে সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া বর্ষে বর্ষে মহানগরীতে জাতীয় মহাসমিতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ উন্নতিকর সভা সমিতি দেখিয়া আর বঙ্গের পূর্ব্বাপর ধর্ম্মী ও কর্ম্মীদিগের মহৎ জীবন ও তাঁহাদিগের শুভদায়ক ও পুণ্যময় কার্য্য স্মরণ করিয়া

আমাদিগের মাতৃভূমিকে ঘিরিয়া আছে, কালে তাহা বিদূরিত হইবেক ? একারণ এ প্রসঙ্গটুকু এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক মনে না করিয়া বরং তাহার অধিকতর বর্ণনে প্রাণ সহজেই প্রধাবিত হয় ; ফলে প্রাচীন ও নবীন কালের যে সমাবেশ, যাহাতে জাতীয় মহৎ ভাবের অভ্যুদয় হয়, সেই যুগ এখন দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পুণ্যশীল ভিক্ষাকরের ক্ষয়োন্মুখ বংশ গৌরব ও ঐ যুগমাহাত্ম্যসূচক শুভ চিহ্ন কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহার বাহ্যাকার দেখিয়াও তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের লাঘব হেতু ভাবী ফল যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। তবে পরম পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ও পিতৃগণের পুণ্য স্মরণ করিয়া এই অনুমিত হয় যে ধর্ম্মপ্রাণ সন্তোষ নারায়ণ যখন তাঁহার অমোঘ পুণ্যবলে আপনার বংশ রক্ষা করিলেন ; এবং ভিক্ষাকর রূপ সুপুত্র লাভকরত পুণ্যবান বলিয়া স্বয়ং ও পুত্র উভয়ে যশোভাজন হইলেন

বর্ত্তমানে ক্ষয়োন্মুখ হইলেও তাহা কালে বর্দ্ধিত হইবে।

ভিক্ষাকর যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখন তাঁহার ভগ্নী গৌরমণি উল্লিখিত পুণ্যাহ স্থলের মারামারি ও কাটা-কাটির ক্ষেত্র হইতে ভিক্ষাকরকে লইয়া গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়া বাস করেন, তাহা কতকটা তাঁহার পিতা সন্তোষনারায়ণের জীবনীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌরমণির ঐকান্তিক ভ্রাতৃস্নেহ ও বহুগুণান্বিত শক্তি প্রভাবেই ভিক্ষাকরের শিক্ষা দীক্ষা ভালরূপ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ পাইয়াছিলেন। তিনি দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে এতাধিক বলীয়ান্ ছিলেন যে একজন সবলকায় জাপক ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। আর ধর্ম্মপালনে কর্ম্ম-ক্ষেত্রের বিবিধ কার্য্যে তিনি বহুতর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। শরীর, মন ও আত্মা এই তিনের সমঞ্জস উন্নতি সাধনে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া

এত প্রাচীন হইয়াও তিনি যথেষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন; কেবল শেষ বয়সে চক্ষু হারাইয়া দৃষ্টি-হীন হইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার সমসাময়িক একজন অতি প্রাচীন ব্যক্তিকে গল্পচ্ছলে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম যে ভিক্ষাকর চৌধুরী প্রাচীন বয়সে চক্ষুহীন হইয়াও যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন। ফলে তাঁহার অগ্রজা গৌরমণি ঠাকুরাণীর নারীসুলভ স্নেহ মমতা ও পুরুষসম দৃঢ়তর শিক্ষার প্রণালীতে ভিক্ষাকর যেমন সুকোমল-হৃদয় তেমনি সুদৃঢ়প্রভাবাপন্ন স্বভাব লাভ করিয়া-ছিলেন। প্রশান্ত ও গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া তিনি কি ধর্ম্মক্ষেত্রে কি কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন। ইহা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে প্রশংসা করিত, আর তাঁহার যশসহ গৌরমণির যশ-কাহিনী গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা একসঙ্গেই গাহিতেন। রামায়ণে ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার স্নেহমমতা ও ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শিক্ষা ক্ষেত্রের অনেক কথা শ্রবণ করা যায়, পরন্তু

সুদৃঢ় আত্মপ্রভাব বিদ্যমান থাকায় ভ্রাতার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হওয়ার কথা কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না। তাই গৌরমণি ঠাকুরাণী সেকালে নারী-কুলের একটী উচ্চ আদর্শ এবং অতি উজ্জ্বলমণি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

পিতৃমাতৃহীন ভিক্ষাকরের তৎকালীন উপযুক্ত শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের হেতুই তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। এই ভগ্নীর পরিচালনা প্রভাবে ভিক্ষাকর চৌধুরীর ধর্ম্ম কর্ম্মবুদ্ধি ক্রমে এতাধিক মার্জ্জিত ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছিল যে তিনি পৈতৃক জমি-দারী সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক চালাইয়া এবং নিজ শরিক-দিগের ও অন্য গ্রামের জমিদার ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি-দিগের সহিত সদ্ভাব ও কুশল রক্ষা করিয়া ধনে মানে কুলে শীলে নিরাপদ ও সুখী হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ তেজারতি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায় হইয়াছিল এবং তিনি মহাজন বলিয়া দেশে বিখ্যাত হইয়া-

বড় মহাজন বলিয়া পরিশেষে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তিনি ধান্য ও শস্যাদিপূর্ণ গোলাবাড়ী বিস্তর পরিমাণ বাগড়ি দেশে ও অন্যান্য দেশেও স্থাপন করিয়াছিলেন; শুনা গিয়াছে তাহার সংখ্যা ৩২টী ছিল। ধান্যের দাদন কার্য্যে তাঁহার দেড়িলাভ এবং তমসুকে টাকা ধার কর্জ্জ দেওয়া কার্য্য একজন মহাজন ব্যাঙ্কারের (Banker) ন্যায় প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত নীলকুঠী ও রেশমকুঠী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কার্য্য ভালরূপে চালাইয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেন। ইনি বিশেষ পরিমিতব্যয়ী ছিলেন, তাহাতে অনেকে তাঁহাকে কৃপণ বলিত; কিন্তু যাহাদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্মবুদ্ধি সুমার্জ্জিত ছিল, তাহারা ভিক্ষাকরকে কর্ম্মক্ষেত্রের একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করিতেন। ইনি সাধারণের উপকারের জন্য পুষ্করিণী ও ইঁদারা (বৃহৎ কূপ) খনন এবং পথের ধারে ধারে বট পাকুড় বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তাহা শাস্ত্রানুসারে প্রতিষ্ঠা

উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। পথিক ও আগন্তুকগণ ধোড়াদহ গ্রামে এখনও সে সকল শুভ-কর্ম্ম ও সৎকীর্ত্তির চিহ্ন দেখিয়া ভিক্ষাকরের যশ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ধনবান্ হইয়াও ভিক্ষাকর চৌধুরী সামান্য বেশ-ভূষায় অন্তরে ও বাহিরে বৈরাগ্য ভাবে জীবন যাপন করিতেন; আর গৃহস্থালাতে সচরাচর অধিক ব্যয় বিধান হইতে দিতেন না, কিন্তু বারমাসে তের পার্ব্বণ ও ক্রিয়াকলাপে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া দান ধ্যান ও পরসেবায় রত থাকিতেন। যেখানে প্রকৃত জীবন ধর্ম্মের উপর স্থিত এবং শুভকর্ম্মরূপ ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত সেস্থলে স্থূল-দর্শীরা তাহার উপরিভাগে বালি দেখিয়া হতাশ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ যে বালি খনন করিয়া যখন উপা-দেয় জলপান করেন এবং অন্যকে পান করান, তখন সকলেই তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ভিক্ষাকর তাঁহার পিতা সন্তোষ নারায়ণের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে যখন

করিয়া ভোজন করাইতেন, তখন তাঁহার জীবনের প্রকৃত শোভা প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

ভিক্ষাকর চৌধুরী অভ্যস্ত ভাবে এমনই ধর্ম্ম ও কর্ম্মশিক্ষক ছিলেন যে নিজগৃহের সকলকেই তাহা শিখাইয়া সুনিয়মে চলিতে শিক্ষা দিতেন এমন কি তাঁহার ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত সত্যপরায়ণ হইয়া সুদৃঢ় ভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করিত। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য ঠাকুর দাস, গুরুচরণ দাস, হারাণী মৃধা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া প্রাচীনেরা অনেক গল্প করিতেন। তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক ছিল; কিন্তু তাহাদিগকে তিনি তাঁহার ছায়ার ন্যায় দেখিতেন এবং সমভাবে ভালবাসিতেন। কোন কোন প্রাচীন মুসলমান ভৃত্যের মুখে ভিক্ষাকরের প্রশংসা শুনিয়া আমরা বাল্যকালে কত না আনন্দিত হইতাম! ফলতঃ স্নেহ দয়া মায়া ভালবাসা ক্ষেত্রে ভিক্ষাকরের সদ্ভাব ও পুণ্যবলে কি হিন্দু কি মুসলমান ভৃত্য বা প্রজা সকলেই তাঁহার উদার ব্যবহারে প্রীত ছিল।

গৃহস্থালীর কি জমিদারীর সুব্যবস্থা ও শাসনে কেমন এক হিতৈষণার প্রবাহ ভিক্ষাকরের সংসারে বহিতে থাকিত। একারণ তাঁহাকে সকলে যথোচিত ভয় ও আন্তরিক ভক্তি করিত। যদি কখন তাঁহার পুত্রেরা একটু অনিয়মে কি বেয়াদবি ধরণে চলিত, ভৃত্যেরা "কর্ত্তাকে বলিয়া দিব" বলিয়া তাহাদিগকে শাসন করিত। একদা ভিক্ষাকরের কয়েকটী বালক পুত্র ও পৌত্র একটী ঘরে বসিয়া গোপনে তামাক খাইতেছিল। তাঁহার একটী ভৃত্য তাহা দেখিয়া বলিল 'তোমরা থাক' কর্ত্তাকে বলিয়া দিব।" ইহা শুনিয়া বালকেরা সেই কৈবর্ত্ত দাস ভৃত্যকে বলিল "আমরা তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমি কর্ত্তাকে বলিও না।" সে ভৃত্য বলিল "ব্রাহ্মণ হয়ে কি শূদ্রের পায়ে পড়া বলিতে আছে? আচ্ছা তোমরা বল আর কখনও তামাক খাইবে না?" তাহাতে তাহারা স্বীকৃত হইলে ভৃত্য সহাস্য বদনে চলিয়া গেল।

যাইতেছে যে, সেকালে পিতার ভৃত্যকে পুত্রেরা যেরূপ মানিত, এখনকার কালে স্বয়ং পিতাকেও সেরূপ মানে না। এখন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া ও তাঁহার অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলা ফিরা পুত্র-দিগের মধ্যে যেন একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ রোগের প্রতীকার যে কোথায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। কবে যে বঙ্গীয় সমাজে এই ধর্ম্মবিগর্হিত ভাব ও বীভৎস দৃশ্যের অপনোদন হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। পিতৃ মাতৃ সম্বন্ধ অতীব গুরুতর এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসনও বিস্তর। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ কাব্য, স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্র এই সমস্তেই পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে কত না উপদেশ বাক্য বর্ণিত আছে। তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য ও অতিথিকে দেবতুল্য জ্ঞান কর।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।

মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেক।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।

ন তস্য নিস্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥ (মনু)

সন্তান হইলে পিতামাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।

পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

(মহানির্ব্বান তন্ত্র)

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

শেষ শ্লোকের তাৎপর্য্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

"কদাপি পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কোমল বচনে তাঁহাদিগের সহিত

সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক। অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেক। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ-ভোগের কামনা খর্ব্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হন। ইহা দ্বারা কুল পবিত্র হয়।"

পিতৃমাতৃভক্তি সন্তানের হৃদয়ে পোষিত হইলে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে তাহাদিগের কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। যেখানে তাহার অভাব, সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও চিরদুঃখ বিরাজমান থাকে, তাহার

কোন সংশয় বা দ্বিধা হয় না। সন্তোষ নারায়ণ চৌধুরীর জীবন কাহিনীতে দেখান হইয়াছে যে তাঁহার পুত্র ভিক্ষাকরের কীদৃশী পিতৃভক্তি ছিল। তিনি যেমন পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে সেই ভক্তির বিকাশ আশ্চর্য্য ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ভিক্ষাকর চৌধুরীর জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিতে আজকাল অনেকে বিমুখ দেখিয়া তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যাবলী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বর্গীয় রামকমল চৌধুরী।

১৭০০ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর এলাকার মধ্যে ধোড়াদহগ্রামে বুনিয়াদি চৌধুরী বংশে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমন্বিত মহামতি ভিক্ষাকর চৌধুরীর ঔরসে রামকমল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তখন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন। চৌধুরীদিগের ভবনে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য পাঠশালা এবং পারসী ভাষা শিক্ষার জন্য একটি মোক্তব সংস্থাপিত ছিল। তৎপরে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাদান জন্য একজন মাষ্টার নিযুক্ত হইলে উক্ত বংশোদ্ভব ও আত্মীয় স্বজনদিগের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পাঠশালায় ও মোক্তবে রামকমল বাল্যকালে ঐ উভয় ভাষায়

ছিলেন। তারপর তিনি মুর্শিদাবাদে পলাইয়া গিয়া নিজামতের চকে স্বাঁকারীবাবু নামে কোনও পশ্চিম-বাসী দয়ালু ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার সহায়তায় পারস্য ভাষা অধিকতর শিক্ষালাভ করিয়া সেই ভাষায় একজন "লায়েক" বলিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ধনাঢ্য জমিদারের পুত্র হইয়া কেন এরূপ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন, সে সম্বন্ধে যে কাহিনী ঐ চৌধুরী বংশের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শ্রুত হওয়া গিয়াছিল তাহা স্বাবলম্বন, আত্মোৎকর্ষ ও আত্মোন্নতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া নিম্নে তাহার বর্ণন করিতেছি।

রামকমল যখন বাল্যকাল হইতে যৌবনে পদার্পণ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি কবুতর (পায়রা) উড়াইতে ভালবাসিতেন বলিয়া কোন কোন দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে অনুপস্থিত হইয়া পড়িতেন। ইহাতে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী একদিন বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট গিয়া

সময়ে খেতে আসে না।” ইহা শ্রবণে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন “এমন ছেলেকে ছাই খেতে দিতে পার না?” রামকমল তাহা শুনিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিয়মিত সময়ে আসিয়া আর আর সকলের সহিত পাত * পাড়িয়া আহার করিতে বসিলেন। ভিক্ষাকরের রন্ধনশালার বৃহৎ গৃহে তাঁহার পুত্র কলত্র ও ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারিগণসহ প্রায় ৪০ জন পুরুষ একত্র ভোজন করিত, আর ভিক্ষাকরের স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ভিক্ষাকরের পত্নীই সকলকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেন। সেই দিন পরিবেশন কালে তিনি রামকমলকে কিছুই দিতেছেন না দেখিয়া কেহ কেহ বলিলেন, “কমলকে কিছুই দেওয়া হয় নাই, তার পাতা খালি পড়িয়া আছে।” অতঃপর

* কলার পাতা যাহা ভিক্ষাকর চৌধুরীর নীলকুটী ও গোলাবাড়ীর বাগান হইতে নিত্য নিত্য আনিত হইয়া

পরিবেশনকারিণী ভিক্ষাকরের স্ত্রী এক হাতা ছাই লইয়া আসিয়া তাঁহার পুত্র কমলের পাতে স্থাপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বামীর আদেশ প্রতি-পালিত হইল এবং পুত্রেরও যে দোষ ছিল, তাহারও প্রতীকার হইল। তৎপরে অন্নব্যঞ্জনাদি যথানিয়মে পৃথক্ পাত্রে দেওয়া হইলে, তিনি তাহা ভোজন করিলেন; এখনকার ছেলেদের মত গর্ব্বভরে পিতা মাতার প্রতি রোষপূর্ণ ঝাল ঝাড়িয়া উঠিয়া গেলেন না। রামকমল তাঁহার দোষের জন্য পিতা মাতার প্রদত্ত দণ্ড অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন, "আত্মসংশোধন করিব এবং ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়া পিতা মাতা প্রভৃতির সন্তোষভাজন হইব।" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহ তিনি গৃহত্যাগ করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ সহরে অবস্থানকরতঃ পারসী ভাষা অধিকতররূপে শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অচিরে তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। স্বীকারী বাবুর

তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি পারস্য ভাষায় যথেষ্ট শিক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ বাবুই তাঁহার জীবনের কৃতকার্য্যতা ক্ষেত্রে দৈব ও মূল সহায়ক ছিলেন। একারণ স্বীকারী বাবুর নাম যখনই তিনি করিতেন তখনই কেমন এক গভীর কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ভাবে গদ গদ হইতেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ষ্ট্যাম্পের দারোগার পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। সেই সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "ক্রোক সাঁজোয়ালীর পদে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত "বাহেরবন্দ" পরগণায় গমনান্তর সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে কাশীম-বাজারের রাজা হরিনাথ বাহাদুরের রাজ সরকারে নিয়োজিত হইয়া উক্ত বাহিরবন্দ পরগণার সম্বন্ধে ক্রোক সাঁজোয়ালী শেষ হইলে প্রাথমিক সুবন্দোবস্তের ভার অর্থাৎ জমান-বিসি পদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিচ উক্ত রাজ-গুরুবংশীয় এক ব্যক্তি বাহেরবন্দর পরগণার

পরায়ণ গুরুভক্ত মহারাজ তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজের পরামর্শ ও আদেশমতে তাঁহাকে (রামকমল চৌধুরীকে) জমানবিসির পদস্থ থাকিয়া নায়েবী কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে হইত। উভয়ের বেতন সমান ছিল। শুনিয়াছি তখন বাহেরবন্দের নায়েবের মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা ছিল। পরন্তু নজরানার টাকাটা সমস্তই নায়েব জমানবিস ও মহরিয়গণ তৎকালীয় রাজব্যবস্থানুসারে পাইতেন। নায়েবের ও জমানবিসের বেতন সমান বলিয়া পাছে রাজগুরু কুলোদ্ভব ঐ নায়েব মহাশয় কিছু মনে করেন একারণ বুদ্ধিমান্ ও সতত কুশলপ্রিয় মহারাজ হরিনাথ উক্ত চৌধুরীকে বলিয়া দেন তোমার রোজবেতন ২৲ টাকা করিয়া লইবা। উক্ত চৌধুরীকে মহারাজ বড়ই বিশ্বাস করিতেন ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এ হেতু তিনি যে রাজাজ্ঞা পাইতেন তাহা বিনা ওজরে বা সচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেন।

বন্দে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়া রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন তখন মহারাজাকে তাঁহার চাকরেরা তৈল মর্দ্দন করিতেছিল। রামকমল চৌধুরীকে দেখিয়া মহারাজ হরিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি চাও? চৌধুরী বলিলেন—আমার নিযুক্ত পত্র লইতে আসিয়াছি, এখনও আমার সনন্দ পাই নাই। মহামতি মহারাজা তাহাকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন "ঐ দেখ দেওয়ালে লেখা তোমার সনন্দ।"

সেই সনন্দ কাঁচা হরিদ্রাতে লেখা ছিল এই :—
"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যেন বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে নরাঃ নরকে যান্তি যাবৎ চন্দ্র দিবাকরৌ।"

রামকমল উহা পাঠ করিয়া বলিলেন—মহারাজ! ঐ শ্লোক আমার জানা আছে।" তখন মহারাজ বলিলেন তবে আর বিলম্ব কেন রওনা হইয়া বাহির-বন্দে চলিয়া যাও।"

রামকমল চৌধুরীর ধর্ম্মভাব এমনি প্রবল ছিল যে তিনি কি মনিবকে কি সমবয়স্ক ব্যক্তিগণকে

করিতে সক্ষম হইতেন। প্রায় ১০ কি ১১ বৎসর তিনি বাহেরবন্দ পরগণায় কর্ম্ম করেন। পূর্ব্ব নায়েব নায়েবী কার্য্য হইতে অবসর লইলে পর তিনি নায়েবী পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে অনেকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে বেনামী করিয়া একটা বড় রকম জোত জমা লন (যাহা তাঁহার পরবর্ত্তী বড় কর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছিলেন শুনা যায়) কিন্তু তিনি তাহা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিত্র ভাবে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া মিত্রদ্রোহী করা তাঁহার নিকট অতিশয় অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। মহারাজ হরিনাথ যেমন ধর্ম্মপ্রাণ প্রেমিক পুরুষ ছিলেন তেমনি রাজকার্য্যে বিচক্ষণ ও সুবিবেচক ছিলেন। একারণ তিনি উক্ত চৌধুরীর প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন এবং তিনি সদরে কাশীমবাজারে আনীত হইলে তাঁহার প্রতি মহারাজ আত্মীয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সে কাহিনী অতি দীর্ঘ। তাঁহার প্রমুখাৎ সে সম্বন্ধে যাহা যাহা

বর্ণন করা হইল। ফলে "জহুরি জহর চিনে, চিনে রতনে, রতন" এই যে প্রবাদ বাক্য আছে তাহা অনুসরণ করিয়া বলি যে ধর্ম্মপ্রাণ রামকমল চৌধুরীকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ হরিনাথ বেশ চিনিয়াছিলেন।

রামকমল চৌধুরী কাশিমবাজারে আসিয়া কয়েক বৎসর উক্ত রাজ সংসারে মহারাজার আদেশানুযায়ী বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরলোক গমনান্তে তিনি তথা হইতে বিদায় লইয়া জন্মভূমি ধোড়াদহ গ্রামে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তখন তাহার উদারতা, দয়া, ন্যায়পরতা দেখিয়া ঐ গ্রামবাসীরা তাহাকে কত না প্রশংসা করিত। তিনি এখন ইহলোকে নাই, তথাপি প্রশংসার সেই প্রবাহ ঐ গ্রামে জনশ্রুতিরূপ জলধিতে এখনও প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে "ন" ছিলেন বলিয়া তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহার জন্মভূমির

ধোড়াদহের চৌধুরী বংশের নকর্ত্তার ও তাঁহার পুণ্য-শ্লোক পিতা মহাত্মা ভিক্ষাকর চৌধুরীর নাম লইয়া লোকে তাঁহাদের কত না যশোঘোষণা করিয়া থাকে। পল্লিগ্রামে চার পাঁচ বংশ পরম্পরা এইরূপ হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ ধোড়াদহ গ্রামে এ পর্য্যন্ত রামকমল চৌধুরী (নকর্ত্তা) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্রজসুন্দরীর (ন ঠাকুরাণী) নাম যেরূপ প্রশংসার সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে এমন কাহার সম্বন্ধে দেখা যায় না।

ভিক্ষাকর চৌধুরী অনেকগুলি পুত্র কলত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহারা যথেষ্ট সম্পত্তি লাভ করিয়া, পরে বঙ্গদেশে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" তাহাই হইল। কিন্তু পৃথক হইবার কালে কোন প্রকার কলহ, বিবাদ কি পৃথক হওয়ার গুণ গরিমা "হুজুকে বাঙ্গালা" প্রবাদ বাক্যের প্রভাবে কিছুই প্রকাশ হইল না। লোকাপবাদ যাহাতে না হয়, তাহার

ছিলেন। ইহাতে জন সমাজে তাঁহাদিগের অত্যন্ত কুশলপ্রিয়তা ও ভদ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল; এবং লোকের নিকট তাঁহারা বিশেষ যশোভাজন হইয়াছিলেন।

ভিক্ষাকর চৌধুরী তাঁহার দুইটী কন্যাকে, তৎকালীন ধনী মানী জমিদারদিগের কুল প্রথানুসারে, কুলীন পাত্রে সম্প্রদান করিয়া জন্মভূমি ধোড়াদহ গ্রামে তাঁহাদিগের আবাসস্থান ও ভরণ পোষণের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদিগকে ভ্রাতাদিগের গলগ্রহ হইতে হয় নাই; পক্ষান্তরে তাঁহারা ভ্রাতাদিগের নিকট অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মানের পাত্রী বলিয়া পরিগণিতা ছিলেন। তদ্ভিন্ন উক্ত চৌধুরী বংশের ধারাবাহিক রীতি অনুসারে ভ্রাতৃগৃহে ভগিনীদিগের কর্তৃত্ব (গৃহিণীপনা) তাঁহাদিগের পক্ষেও ঘটিয়াছিল। ইহাতে উভয় পক্ষের অনেক কল্যাণ সাধিত হইত। আজ কাল যেমন বাঙ্গালা দেশে পরিজনদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সকলকেই স্ব

তাহা ছিল না। সে সময় গুরুজনদিগের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব কনিষ্ঠ পক্ষেরা মান্য করিতেন, সে দৃশ্য এখন বিরল। তাই গৃহে গৃহে কত না অশান্তি বিরাজ করিতেছে। নারীদিগের "হিষ্টিরিয়া" রোগ ও পুরুষ-গণের মতিচ্ছন্নতা তাহার প্রধান কারণ। গৃহে গৃহে দিনের মধ্যে মহিলারা বার বার পড়া উঠা করিয়া এই নব যুগে গৃহস্থলীতে দুঃখ রূপ রঙ্গমঞ্চে কত মত অভিনয়ই (থিয়েটার) দেখাইতেছে। তাহার হিসাব ডাক্তার মহাশয়েরা, সংসারাভিজ্ঞ ও স্ত্রৈনতাবিহীন ব্যক্তিরা ঠিক্ ঠিক্ দিতে পারেন।

ভিক্ষাকরের পুত্রেরা পৃথক্ হইবার সময়ে সৎ-পরামর্শ সহ শান্তি ও কুশলে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে কুশলপ্রিয় রামকমল চৌধুরীর সৌজন্য ও ত্যাগস্বীকার সহ তাঁহার ধীরতা ও সাধুতার মধ্য দিয়া এরূপ অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহার সদ্দৃষ্টান্তে "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" স্থলেও ভিক্ষাকরের বংশে একটা শান্তিপূর্ণ ভাবের যশোসৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ

হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে রামকমল চৌধুরী ভিক্ষাকরের চতুর্থ পুত্র। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অটুট ও অচল ছিল। তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি অধিক ভাল বাসিতেন। সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা খুব বিলাসপরায়ণ ছিলেন; এবং রামকমলের উপার্জ্জিত অর্থের অনেকাংশ সেই বিলাসক্ষেত্রে অপচয় করিতেন। ভ্রাতৃগণ সকলে পৃথক হইলে পর তাঁহার ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে বড় একটা মানিতেন না। অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ রামকমলের প্রতি তিনি কখন কখন চপলভাব বশতঃ কটু ভাষা প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু তিনি তাহাতে হাসিতেন এবং কনিষ্ঠের প্রতি বিরক্তভাব প্রকাশ করিতেন না। যাহারা তাহা দেখিত, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিত "কমল চৌধুরির ধৈর্য্য ও ক্ষমা যেন দেবতাদের ন্যায়।" বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয়ে অশেষ ধৈর্য্য, উদারতা ও

সে স্নেহ, সে প্রেম কোথা হইতে উদ্ভূত হইত। ভগবৎ প্রেম এবং তাঁহার পিতৃভক্তি তাঁহার উৎপত্তির মূল কারণ ছিল।

উক্ত চৌধুরির দয়া ও স্নেহ এত গভীর ছিল যে, উজির সেখ নামক তাঁহার বাগানের একটী ভৃত্যকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। ঐ ভৃত্যের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্বয়ং তাহার চিকিৎসা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিতে দেখা গিয়াছিল। ভৃত্যের প্রতি কেমন তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া এবং স্নেহের ভাব ছিল তাহা দেখিয়া ঘোড়াদহবাসিগণ অবাক হইত।

স্বগ্রামে চৌধুরীবংশের এক সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতির বাটীতে একটী বিবাহের পাকস্পর্শ ভোজের আয়োজন খুব সমারোহে ও বিশেষ বড় মানুষী ধরণে হইয়াছিল। সেই ভোজে রামকমল চৌধুরী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেক স্বজনবর্গসহ একত্রে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। ভোজনকালে অন্ন ব্যঞ্জন হইতে বহুতর মিষ্টান্ন সামগ্রী সহ লুচি পরি-

বেশিত হইলে পর তিনি সেই ভোজের বাটীর কর্ত্তাকে (যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে নাতি হইতেন) মধুর সম্ভাষণে বলিলেন “ওহে ভাই! গুড় আনত, লুচি বেশ ক’রে খাওয়া যাক্।” তৎক্ষণাৎ গুড় আনীত ও তাঁহার পাতে প্রদত্ত হইল,—দেখিয়া তাঁহার স্বাভিমানী গর্ব্বিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ রামকমলের প্রতি মনে মনে খুব চটিয়া গেলেন এবং ভাবিলেন এতগুলি বড় লোক জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে বসিয়া গুড় চেয়ে খাওয়া নিন্দনীয় এবং কাঙ্গালে কথা;—তাহাতে আপনাদিগকে দশের মধ্যে ছোট করা হইল—এই ভাবনায় গর্ব্বিত কনিষ্ঠ মনে মনে নিরানন্দ ভোগ করিতে লাগিল। ভোজনান্তে বাটী গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলকে রাগ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়! আপনার এ কিরূপ কাণ্ড?—এত বড় সমারোহের ভোজে চিনি মিষ্টান্ন পাতের কাছে থাকিতে গুড় চাহিয়া খাইলেন?” তাহা শুনিয়া রামকমল স্বাভাবিক সহাস্যবদনে বলিলেন

কনিষ্ঠ, ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের মিষ্ট সম্ভাষণে প্রকৃত তত্ত্ব-কথায় পরাস্ত হইয়া কিছু না বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য রামকমল চৌধুরী বৈষয়িক ও সামাজিক এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন যে তাহার বর্ণনা হয় না।

একবার কালেক্‌টরির লাটের খাজনার অনাটন হওয়ায় প্রাগুক্ত কনিষ্ঠ তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে বলিলেন্ "দাদা আপনি কিছু টাকা দেন, লাটের খাজনার টাকার অভাব হইয়াছে।" (যে টাকার অভাব হইয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ হাজার টাকারও কম হইত) উত্তরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন "তোমার ভাজের নিকট টাকা রাখা আছে তাহা হইতে লাটের খাজনার জন্য যাহা প্রয়োজন হয় লওগে।" তিনি তাহার ভাজের নিকট গিয়া তাহা জানাইলে তিনি বলিলেন "আমি এক্ষণে রাঁধি-তেছি,—যাইতে পারিব না, আমার আঁচলে চাবি বাঁধা আছে খুলে লও এবং বাক্স খুলিয়া যে টাকার

খুলিয়া দেখেন যে তাহাতে তিন হাজার টাকা আছে। সেই টাকাগুলি সমস্ত তিনি লইয়া গিয়া চাবিটী চুপ করিয়া তাঁহার ভাজকে ফেরত দিলেন। পরে রামকমল চৌধুরির সহধর্ম্মিণী বাক্স খুলিয়া দেখেন সমস্ত টাকা তাঁহার দেবর লইয়া গিয়াছে। এই ঘটনা তাঁহার স্বামীকে জানাইলে পর তিনি বলিলেন "একথা কাহাকেও বলিও না,—বলিলে আমার ভ্রাতার বড় দুর্নাম হইবে ;—বড়ই লোক-নিন্দা হইবে।" এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জনৈক আত্মীয় ব্যক্তি রামকমল চৌধুরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি ঐ স্বেচ্ছাচারী ও দুর্দ্দান্ত ভ্রাতাকে এত ভালবাসেন কি করিয়া ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে "বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, তাই আমি উহাকে ভালবাসি।" প্রশ্নকারী ইহা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন। ফলে এইরূপ ভালবাসার মূলে প্রগাঢ় পিতৃভক্তির কেমন একটা অদম্য টান রামকমলের হৃদয় কন্দরে বদ্ধমূল ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

এই যে ধরাধাম তাহা ধর্ম্মের আবহ ও পাপের দণ্ডদাতা এবং পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা বিধাতা পুরুষের রাজ্য। এখানে কেহ যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা এবং নিয়ম উল্লঙ্ঘন বা তাঁহার প্রতি অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচার বশতঃ অনাচারী, দুরাচারী ও অত্যাচারী হইয়া সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিবে তাহা কখনই হইতে পারে না। বিশ্বরাজ বিশ্ববিধাতা জীবের কর্ম্ম-ফলানুযায়ি ফল দান করিয়া থাকেন। যাহাতে কর্ম্ম ভাল হয়, এবং পাপ অপরাধ অপনোদন হইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া সাধু, মহাজন, শাস্ত্রবিৎ এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচারকগণ কত কত শাস্ত্রবিধি ও সদুপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। যাহারা তাহা অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া মোহজালে আবৃত হয় তাহারা নিজের, অপরের, স্বপরিজনের ও জন্ম ভূমির প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে কত না দুর্গতি ভোগ করে। এমন যে দুর্ল্লভ মানব জন্ম তাহা তাহারা প্রাপ্ত হইয়া কোথায় মানব হইতে

দেব ভাবের উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবে, তাহা না করিয়া পশব ভাবাপন্ন হইয়া তাহারা কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া জনসমাজে কালকুটরূপ কুদৃষ্টান্ত রাখিয়া যায়।* এই ক্ষেত্রে যিনি জ্ঞান ও প্রেমের সাধন ও শুভকর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা জীবনে সৎ দৃষ্টান্ত বা উচ্চ আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারেন তিনি ধন্য এবং নরোত্তমদিগের মধ্যে গণ্য। স্বর্গগত রামকমল চৌধুরী বহু পরীক্ষায় পতিত ও দুঃখ ক্লেশে আবৃত হইয়া নিজের সাধুভাবের এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরজনিত নিগূঢ় প্রেমের বলে সেইরূপ মহৎ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

ধোড়াদহ চৌধুরী বংশের এবং গ্রামবাসিদিগের অনেকের এই ধারণা ছিল রামকমলের অশেষ

---

* "যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রো হীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥"

"যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয় ॥" (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব)

সাধুভাব ও গাঢ় প্রেম তাঁহার ঐহিক জীবনক্ষেত্রে বহু কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করার কারণ হইয়াছিল। ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা। ধর্ম্মপ্রাণ রামকমল চৌধুরী মহাশয় বিষয় কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া এবং ভাল মন্দ সমস্তই বিচারক্ষম হইয়া কেবলমাত্র কুশল রক্ষা হেতু ধীরতার সহিত তাঁহার দৈব ও পুরুষার্থতা বলে যে এইরূপ সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন ইহাই এখন সিদ্ধান্তের স্থল হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার একান্ত নির্ভরের ভাবই ঐরূপ ইষ্ট লাভের হেতু তাহা পরবর্ত্তী জীবনের সৎসাহস ও পুণ্যপ্রদ কার্য্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তিনি ধোড়াদহের গৃহত্যাগ করিয়া মোকাম সৈদাবাদের এক পুরাতন ও গঙ্গাবাসের গৃহে গিয়া তাহাতে একান্তে বাস ও ধর্ম্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রায় ৬ বৎসর কাল সেখানে শান্তিপূর্ণ জীবনে গঙ্গাবাস করিয়া পরে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন।

তাঁহার প্রয়ানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার উক্ত গৃহে পঞ্চবটীর বৃক্ষ লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐ পঞ্চবটীতলে তাঁহার দেহত্যাগ হয়; কিন্তু তাঁহার নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার সে ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়াছিল না।

স্বর্গগত রামকমল চৌধুরী যেমন ধর্ম্মজ্ঞানী তেমনি প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি ধর্ম্মকে সদাই মধুময় জ্ঞান করিতেন। উপনিষদে আছে ঃ—

"ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

"ধর্ম্মাচরণ কর ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম, সকলের পক্ষে মধুস্বরূপ।" (আরণ্যক—উপনিষদ।) তিনি ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। কোথাও একজন ভাল সাধু আসিয়াছেন শুনিলে তাঁহার নিকট না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি পারস্ত ভাষা ভালরূপ জানিতেন বলিয়া সেই ভাষায় কত না ভাল ভাল প্রবচন অর্থাৎ পারস্য দেশীয় জ্ঞানী প্রেমিকদিগের বাণী শ্লোকাকারে বলিতেন। তুলশীদাসের দোঁহা বিস্তর তাঁহার মুখস্থ ছিল। ধর্ম্মালোচনা কালে তাহা অনর্গল বলিতেন ও শ্রোতাগণকে প্রীত করিতেন। তিনি বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

শত্রুর প্রতিও তাঁহার ব্যবহার কত না উদা-রতা ও প্রেমপূর্ণ ছিল। একদিন প্রাতে তাঁহার সয়দাবাদের গঙ্গা বাসের গৃহে বসিয়া আছেন এমন সময় শুনিলেন (অমুক)———র আসন্নকালে উপস্থিত

এবং তাঁহাকে ঘাটবন্দরে গঙ্গা তীরে একটী গৃহে আনিয়া রাখা হইয়াছে।*

ঘাটবন্দরের সে স্থানটী তাঁহার সয়দাবাদের বাসা হইতে এক মাইলের উপর হইবে। বৃদ্ধ রামকমল ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র ঐ মুমূর্ষু আত্মীয়ব্যক্তিকে দেখিতে চলিলেন। সে আত্মীয় কুটুম্ব ব্যক্তি তাঁহার জমিদারিটী সামান্য দেনার জন্য নিলাম করাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এ কারণ তিনি জানিত ব্যক্তিদিগের মহলে শত্রু বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন; তাহা পথিমধ্যে তাহার মনে হইলে পর ভাবিলেন যখন তাঁহার কুষ্ঠিতে "শত্রুঘ্ন যোগ" লেখা আছে তখন গঙ্গাবাসে ঐ আসন্নাবস্থাপন্ন রোগীকে তিনি

* এই ব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব এবং এক সময় তাঁহার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল; কিন্তু সাংসারিক ঘটনাচক্রে সামান্য টাকা দেনার জন্য রামকমল চৌধুরীর গঙ্গাবাসের কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মোকদ্দমাবাজী বুদ্ধি ও দুর্ম্মতিতে তাঁহার জমিদারীটী নিলাম হইয়া যায়। একারণ নিলাম-কারী ও নিলামের জমিদারিটী আত্মসাৎকারীকে রামকমল চৌধুরীর বৈরী মধ্যে অনেকেই গণ্য করিতেন; কিন্তু উদার রামকমল একদিন জন্যও তাহার প্রতি বিদ্বেশ ভাব পোষণ বা প্রকাশ করেন নাই।

দেখিলে কি জানি যদি রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হয়? এই জ্ঞানে—এই ভয়ে তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বাসার সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি রাস্তা হইতে ফিরিলেন কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন আমার কুষ্ঠিতে "শত্রুঘ্ন যোগ" লেখা আছে সেইজন্য গেলাম না। তিনি কুষ্ঠির লেখা বড়ই মানিতেন। সেই পুরাতন বন্ধু ও পরবর্ত্তী বৈরীর আসন্নকালে তাহার জন্য আন্তরিক মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন;—এই আত্মত্যাগের ভাব—এই স্বর্গীয় ভাব কি চমৎকার!*

নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বক্ষেত্রে সাধুব্যক্তির প্রাণ প্রাণময় ঈশ্বরের প্রেম সুধামৃত রসে নিমজ্জিত থাকে, তখন কি তিনি আর বিষয় বুদ্ধির বিষময় রস পান করিতে পারেন? সে রসকে মধুর রসে পরিণত করা পরম

---

* উপনিষদে আছে :—

"নধনেন নপ্রজয়া নকর্ম্মণা ত্যাগে
নৈকেনা মৃতত্ব মানশুঃ।"

অর্থাৎ "না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃত পুরুষকে ভোগ করা যায়।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শ্রীয়)

কৃপানিধান পরমেশ্বরের অপার করুণার ফল। তাই প্রেমিক আত্মা দোষী, অপরাধী, পতিত মানবাত্মাকে জীবের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীহরির হস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তনে রত থাকেন। তাঁহার নিকট মানুষের বুদ্ধি ক্রিয়া ও ক্ষুদ্র চেষ্টার বল খদ্যোৎবৎ। যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহা অন্তরে অন্তরে প্রেমময়ের কৃপায় উপলব্ধি করিয়া আর দোষী ব্যক্তির দোষ দেখিতে চাহেন না। তিনি সেই কৃপাপাত্রের আন্তরিক মঙ্গল কামনা করেন। ইহাই মুক্তির পথ সহজে দেখাইয়া দেয়।

স্বর্গগত রামকমল চৌধুরী মহাশয়ের আত্মা এইরূপ উচ্চ ভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার স্বাভাবিক প্রেম অবলোকন করিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুও মুগ্ধ থাকিতেন। পুণ্যের ও প্রেমের এমনি গুণ যে জনশ্রুতি সূত্রে এখনও স্বর্গীয় রামকমল চৌধুরীর নাম ধোড়াদহ গ্রামে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে তাঁহার বংশের দ্বারা জন্মভূমির ভাবী ফল ভালই আশা করা যায়;—ভবিষ্যৎ ভগবৎ হস্তে!

মূল্য

ফলক-বার্ত্তা।

হরিরূপ ও হরি যশঃ ঘোষণা (পদ্য) ৵১০ (অর্দ্ধ আনা)
হরি ওঁ ঐ ঐ
ধর্ম্মবলে দীপ্তিপায় কর্ম্মের প্রভাব ঐ ঐ
আত্মবশ, কৃতি ও স্বাবলম্বী কে ? ঐ ঐ
উদ্যম ও বঙ্গীয় যুবক ঐ ঐ
"প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর" (মহাকবি সার রবীন্দ্রনাথের গীতাংশ) ঐ
Milton's invocation for inspiration (Poetry)
Affliction a guest (Poetry)

ভারত পরিব্রাজকের বার্ত্তা।

জন্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব (পদ্য) (১ম বার্ত্তা) ৵•
নাম তত্ত্ব ও ভক্তিতে নতাবস্থা (গদ্য) ২য় ঐ ৵০
মানব মণ্ডলে কি সুন্দর দেখায় (পদ্য) ৩য় ঐ ৴০
উত্তরাথওধ্বনি (পদ্য) ৪র্থ ঐ ৵০
সহজজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য (গদ্য) ৫ম ঐ ৵•
স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন ঐ ৬ষ্ঠ ঐ ৵০
বুনো রামনাথ ওরফে (নবদ্বীপের) রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (গদ্য) (৭ম বর্ত্তা) ৵•
ভারত ভ্রমণ ও প্রকৃতিতে প্রাণেশের

		মূল্য
হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন	(পদ্য) ৯ম (বার্ত্তা)	৴৹
ভারত পরিব্রাজকের সম্পূর্ণ কবিতাবলী (ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পদ্যে বহু আলোচনা)	১০ম ঐ	॥৹
ব্রহ্ম নাম ও হরি নাম	(গদ্য) ১১শ ঐ	৶৹
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মযজ্ঞ শান্তিনিকেতন (মহর্ষির প্রতিকৃতি সহিত)	১২শ ঐ	।৶৹
স্বর্গীয় সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত (তাঁহার প্রতিকৃতি সহিত)	(গদ্য) ১৩শ ঐ	।৴৹
রাজর্ষি জনক	ঐ ১৪শ ঐ	৶৹

हिन्दि पुस्तक

राजर्षि जनक । मूल्य ⁄)

प्रणव-तत्त्व (ओङ्कार) । मूल्य ⁄)

नामतत्त्व

और भक्तिमें नतावस्था । मूल्य ⁄)

सहजज्ञान और पाण्डित्य ।

मूल्य ⁄१०)

পশ্চিম—(১) লাহোর আনারকলি বাজার ও ব্রাহ্মসমাজ। (২) রাওলপিণ্ডি আর্য্যসমাজ বুক ডিপো। (৩) বাঁকি. পুর বাজার। (৪) ভাগলপুর বাজার। (৫) গোয়ালিয়ার লস্কর বাজার। (৬) বেনারস সিটী ও আর্য্যসমাজ বুক্ ডিপো; (৭) এলাহাবাদ আর্য্যসমাজ বুক্‌ডিপো।

মফঃস্বল হইতে অর্ডার পাইলে ভি, পি, পোষ্টে পুস্তকাদি পাঠান হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
অধ্যক্ষ—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়।
[illegible] কুখানসামার লেন মৃজাপুর ষ্ট্রীট (দ্বিতল গৃহ)
হারিসন রেড পোষ্ট, কলিকাতা।

[illegible] দ্রষ্টব্য—প্রাগুপ্ত পুস্তকাদি পাঠে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী ও তাঁহাদিগের সন্তান ও আত্মীয় স্বজন প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই। আজকালকার কুরুচি উৎপাদক পুস্তকাদির বিষময় ফল দেখিয়া কত না মনস্তাপ পাইতে হয়। এই কারণে বিশেষ করিয়া আমাদিগের এই প্রচারব্রত অবলম্বন। সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি সানুনয়ে প্রার্থনীয়।

ছাত্রগণের পুরস্কার (Prize) বিতরণের উপযোগী পুস্তক ঐ তালিকার মধ্যে অনেক দৃষ্ট হইবে।